“গীতারত্ন” শ্রীপ্রীতিকুমার ঘোষ প্রবর্তিত ধর্ম ও জাতীয়তাবাদী বাংলা মাসিক পত্রিকা (৬৬ তম বর্ষ)

পার্থসারথি

(মুদ্রণ : জুন, ১৯৬০ থেকে মার্চ, ২০২০ / অন্তর্জালে প্রকাশ : এপ্রিল, ২০২০ থেকে)

Website: https://www.parthasarathipatrika.com

পার্থসারথি

৬৪তম অন্তর্জাল সংখ্যা

৭ই শ্রাবণ, ১৪৩২ / 24.07.2025

-: সম্পাদক :-

সুনন্দন ঘোষ

-: সূচীপত্র :-

(৬৪তম অন্তর্জাল সংখ্যা)

প্রীতি-কণা	শ্রীপ্রীতিকুমার ঘোষ
স্মৃতিচারণ	শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ
জাতীয় সঙ্গীত	শ্রী পূর্ণেন্দু প্রসাদ ভট্টাচার্য্য
পরম পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ – কঠোপনিষদের আলোকে	শ্রী পুরঞ্জন প্রসাদ চক্রবর্তী
শ্রীশ্রীমা ও লক্ষ্মীদিদি	শ্রী প্রণব ঘোষ
ভেলায় ভেসেছি ভেনিসে	শ্রী অরূপ কুমার ভট্টাচার্য্য
বিশ্বরূপের প্রতীক্ষায়	শ্রী সুনন্দন ঘোষ

Founded by Sri Priti Kumar Ghosh in June, 1960, PARTHASARATHI Bengali Monthly Magazine, RNI 5158/ 60, published in print format for sixty years, then converted to e-magazine by Sri Sunandan Ghosh, Editor & Publisher in April, 2020 during prolonged Nationwide Lockdown and now being published through the Website: https://www.parthasarathipatrika.com

Contact: 182 Jessore Road, Flat- D/1, Kolkata- 700074. WhatsApp: 8910977590.

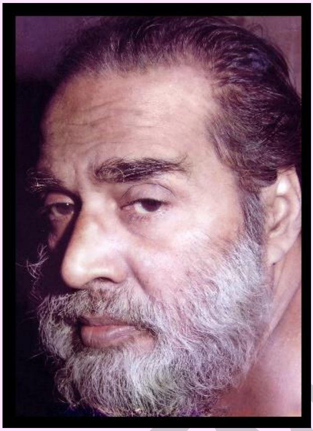

(১০ই মার্চ, ১৯২৬ – ২৪শে নভেম্বর, ১৯৮৬)

প্রীতি-কণা

"জ্ঞানলাভ করলে কর্মত্যাগ করতে হবে তা নয়, নিষ্কাম অনাসক্ত কর্মের ভিতর দিয়ে সিদ্ধিলাভ করা যায়। সিদ্ধিলাভের পরও কর্ম করা চলে, করতেও হবে - কিন্তু সে কর্ম ব্যক্তিগত লাভ অলাভের চিন্তা দ্বারা হবে না, সে কর্ম হবে জগতে ভগবৎ ইচ্ছা সম্পাদন, লোক সকলকে ভগবৎ পথে অগ্রসর হতে সাহায্য করা।"

এবার পুজো ভালোয় ভালোয় কেটে গেলো। আমার দীর্ঘদিন পুষে রাখা ইচ্ছে পূর্ণ হল – "অযোধ্যা দর্শন।" এক যুগের বেশী লক্ষ্ণৌ যাচ্ছি। কোন দিনও মনে হয় নি অযোধ্যা ঘুরে আসি। তাহলে কবেই দেখা হয়ে যেতো। গত ছ' বছরে মোটামুটি কেরালা, কর্ণাটক ছাড়া অন্য সব তীর্থস্থানগুলি দর্শন করবার চেষ্টা করেছি। চারধাম, সপ্তপুরী দর্শন শেষ। উপকার কি হয়েছে জানি না। অন্ততঃ জ্যোতিষীদের কাছে ছুটে যাবার সেই তাগিদটাতো আর নেই। এখন বিশ্বাস করে নিয়েছি যা ঘটবে তা আগে থেকে বলে দেবার মতো লোক অতি দুর্লভ। কোন জ্যোতিষী যদি বলেন আপনি এখন মারা যাবেন না, তাও আমি বিশ্বাস করি না। মৃত্যু কাউকে জানান দিয়ে আসে না। যদি আসতো তাহলে আমার আজ এই অভিভাবকহীন দশা হত না। আমি পুরো জ্যোতিষ শাস্ত্রটাকে উড়িয়ে দিতে চাইছি না। এককালে আমিও অনেক নামী জ্যোতিষীর কাছে যেতাম, কিন্তু কেউই সঠিকভাবে আমাকে বলেন নি আমার নাতি নাতনী কবে তাদের বাড়ি ফেরৎ আসবে, তাই আমি ও পথ ছেড়ে দিয়েছি।

যাক ! এবার অযোধ্যার কথায় আসি। রাম মন্দির না বাবরি মসজিদ – এ বিতর্ক চলছে বহুবছর। রামের জন্মস্থান দেখবার ইচ্ছে যে খুব একটা ছিল তা নয়, কারণ ত্রেতাযুগে কারা জন্মেছিলেন, কি কি হয়েছিল অত জটিলতা আমার মাথায় ঢোকে না। যদি ঢুকতো তাহলে সেই হনুমানটিকে খুঁজে বের করবার চেষ্টা করতাম যে লঙ্কাপুরীতে আগুন জ্বালিয়েছিল। যাই হোক, লক্ষ্ণৌ থেকে ছ' জনের দল নিয়ে অযোধ্যা রওনা হলাম। মোটামুটি তিন ঘন্টায় পৌঁছে গেছিলাম। অতি দূর থেকে "জয় সীয়ারাম" কীর্ত্তন ভেসে আসছিলো। গাড়ী একটু দূরে থামলো। এবার সেই চাতাল দিয়ে চলা শুরু। বিশাল জায়গা ঢালাই হয়েছে। একপাশে বিরাট প্যাণ্ডেল। সেখানে অবিরত কীর্ত্তন হচ্ছে। চোখে পড়লো একটি সাধারণ মসজিদ। রঙ নেই বহুকাল। তখনও মাথায় ঢোকেনি ঐ সেই ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদ। পুরানো তার

চেহারা। গাঁথনির পাথরগুলি ভাঙ্গাচোরা। সেখানে ঢোকবার আগে থেকেই লোহার রেলিং দেওয়া। সে রেলিং আমি দেখেছি উজ্জয়িনীতে মহাকালের মন্দিরে, আরও অনেক মন্দিরে। ত্র্যম্বকেশ্বরে লাইন রাখবার জন্য ওরকম রেলিং-এর ব্যবস্থা আছে। নেই দক্ষিণেশ্বরে যেখানে এখন সবচেয়ে বেশী দরকার।

যাই হোক যত না লোক তার বেশী পুলিশ। শুধু খাঁকি পোশাক আর খাঁকি শাড়ি। মেয়ে পুলিশরা দু'রকম পোষাক পরেই আছেন। সহজে ঢোকা গেলো না। লাইন। আর আপাদমস্তক সার্চ করবার ব্যবস্থা তো আছেই। আমার কাছে এসেই সেই Metal Detector প্যাঁক প্যাঁক করে উঠলো। ফলে সবার নজর আমার দিকে। আগরতলায় যাবার সময় Airport-এ জ্বালিয়েছিল এক সাধুর দেওয়া মাদুলী। তার আকৃতি ছিল প্রায় চার ইঞ্চি। নাতি-নাতনী আসবে বলে একটু বড়সড় মাদুলীই পরেছিলাম। কি বোকাই না ছিলাম । যে যা বলতো বিশ্বাস করতাম। তারা এলোনা দেখে কবেই সে মাদুলি ফেলে দিয়েছি। এবার আবার কি হোল ? এবার শ্রীপ্রীতিকুমারের দেওয়া রুদ্রাক্ষ এবং বঙ্কিমবাবুর দেওয়া একটি লকেট। সেটা দেখবার পর পুলিশ আমাদের Money Purse পর্য্যন্ত জমা নিয়ে নিল। ঢুকলাম। দেখলাম গম্বুজের নীচে চাঁদোয়া টাঙ্গানো। উপরের অংশটা ঢাকা দেবার ব্যবস্থা আর কি! মসজিদে যেখানে সমাধি থাকে সেখানটায় ঠাকুরের আসন যথারীতি জরি ব্রোকেড ইত্যাদি দিয়ে সাজানো। ঠাকুরের আসনে রাম না সীতা (সেটাই স্বাভাবিক) না লক্ষ্মণ তা আমি বুঝতে পারলাম না। আমার চোখের পাওয়ার মাইনাস আট। কাছের লোকই আমি চিনতে পারি না, আর মন্দিরের মূর্তি কি করে চিনবো? তিরুপতি গিয়ে আমি বালাজীর মুখটা দেখবার চেষ্টা করেছিলাম। ফলে তাঁর হাতে বা পায়ে কি আছে দেখি নি। নাকটা তিলকের মতো সাদা রঙয়ে ঢাকা এইটাই মনে আছে। আসলে আজকাল তীর্থস্থানে পিছন থেকে এমন ধাক্কা আসে যে নিজের নিরাপত্তার দিকে নজর দিতে গিয়ে ঠাকুরের আকৃতি আর ভালো করে দেখা হয় না। যাইহোক রামমন্দির দেখলাম। অনেক দূরের জগতের বাসিন্দা আমি। সাধারণ ভাবে দেখে আমার মনে হয়েছিল (হয়তো ব্যক্তিগত বিশ্বাসের কারণে) যে –

মসজিদের চারিপাশে যে 'বিশাল বিশাল অট্টালিকা' তাতে রামের ছায়াই প্রকট। কি সুন্দর কনক ভবন। সীতা যে ওর কোনও একটি ঘরে থাকতেন তা বিশ্বাস করতে একটুও কষ্ট হয় না। দরবার ও আরও অসংখ্য বাড়ী হিন্দু রাজত্বের পরিচয় বহন করছে। হনুমান গড়ী দেখলাম। সত্যি একটি সুন্দর মন্দির। বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় না হনুমানজী ওখানে অবস্থান করেছিলেন। মোটামুটি অযোধ্যা নগরী যে হিন্দু দেব-দেবীর প্রাধান্য নিয়ে গড়ে উঠেছিল তা খুবই স্পষ্ট। অযোধ্যা গিয়ে সবচেয়ে যে লাভ হল তা হচ্ছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বাড়ীটা দেখা। সেখানে "রামমন্দির" যেভাবে রূপায়িত হবে তার Model-টা রয়েছে। আছে অসংখ্য ইঁট সাজানো, বিভিন্ন প্রদেশের নাম খোদিত ইঁট যা করসেবার সময় ওখানে পাঠানো হয়েছিল। আর আছে অসংখ্য আলোকচিত্র যাতে করসেবা চলাকালীন ততকালের প্রশাসনের সঙ্গে সাধুসমাজের সংঘাত এবং মর্মভেদী মৃত্যুর ইতিহাস বিবৃত হয়েছে। খবরের কাগজ পড়া এক, চাক্ষুষ দেখা আর এক। অযোধ্যা না গেলে আমি কোনদিন বুঝতে পারতাম না এই দীর্ঘকালীন বিবাদের উৎসটি কোথায়। মসজিদ বা কনক ভবন সবসময় খোলা থাকে না। মাঝে মাঝে পর্দা টানা হয়। নাট্যমঞ্চের মতো পর্দা সরে যায়। বিশাল জনসমাগম। ধীরভাবে জনতা অপেক্ষা করে। মূর্তি যখন দেখা যায় জনগণের নাভিকুণ্ড থেকে আওয়াজ ওঠে "জয় সীয়ারাম!" স্বতঃস্ফুর্ত আওয়াজ। না হলে এতো জোর কোথা থেকে আসবে? কত বাড়ীতে, আশ্রমে, সাধুদের খাবার দেওয়া হচ্ছে। অন্নের কোনও ঘাটতি নেই। উজ্জয়িনীতে কুম্ভমেলাতে এরকম ব্যবস্থা দেখেছি। দেখেছি ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে পুরীতে রথের সময়, দুর্গাপূজার সময় কাশীতে।

মোট কথা আমার অযোধ্যা দর্শন সার্থক হয়েছে। লক্ষ্ণৌ থেকে ফৈজাবাদ রাস্তাটিও ভাল। অযোধ্যা পুরীও বেশ বিশাল আকার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঐ হিন্দু স্থাপত্যের নিদর্শন যেন কালের প্রভাবকে তুচ্ছ করে দাঁড়িয়ে আছে। আর হয়তো থাকবেও অন্তত সেই ২১১৬ সালের আগষ্ট পর্যন্ত যখন কোন ধূমকেতুর আবির্ভাবে গোটা পৃথিবীটাই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। ভাগ্যিস সে সময় আমার থাকবার কোনও সম্ভাবনা নেই। থাকলে জ্যোতিষীদের অবস্থা খারাপ হয়ে যেতো। বারবার দৌড়ে

গিয়ে তাদের জিজ্ঞেস করতাম, "দেখুন তো ঐ সময়ে আমি বাঁচবো কিনা ......"। আমি জানি জ্যোতিষীরা বলতেন, "আরে না, না, আপনি থাকবেন, তবে ঐ সময়ে রাহু কেতু, ইত্যাদি ইত্যাদি ...." ।

এবার আমার আরও তীর্থদর্শন হয়েছে। তার মধ্যে বিখ্যাত হল বিঠুর। বিঠুর যাবার আগে কানপুর একদিন ছিলাম। সেখানে কৈলাশ মন্দির বিখ্যাত। না গেলে দুঃখ থেকে যেত। শ্রীপ্রীতিকুমার কানপুর বহুবার গেছেন। উত্তরপ্রদেশ বিহারে তাঁর কর্মক্ষেত্র প্রসারিত ছিল। রাজু ও মঞ্জু তাঁকে কানপুরে একটি জমি দেখাতে নিয়ে গেছিলো। আমার যেতে ইচ্ছে করেনি বলে আমি লক্ষ্ণৌতে ছিলাম। ফিরে এসেছিলেন, উদ্ভাসিত মুখে বলেছিলেন , "জানো, ওখানে একটি শিবমন্দির আছে। আমি যেতে সেখানে স্পন্দন অনুভব করলাম।"

শুনেছিলাম, গ্রাহ্য করিনি। শ্রীপ্রীতিকুমার থাকতে আমি ভগবান, ঈশ্বর ইত্যাদি মাথায় নিতাম না। এখনও নিতে পারি বলব না, তবু বিশ্বাস করি তীর্থধর্ম পালন করলে মানসিক উন্নতি হয়। অকারণ দুঃখ কষ্টগুলো থাকে না। অবশ্য এটা আমারই ধারণা। কারও উপর আরোপ করছি না। শ্রীপ্রীতিকুমার কথিত সেই শিবমন্দির দেখলাম। শোনা কথা মিলিয়ে নিলাম। একটুও বাড়িয়ে বলেন নি। সত্যি, কৈলাশ মন্দিরের সেই শিবমন্দির না দেখলে দুঃখ থেকে যেতো। শিবলিঙ্গ তামায় আচ্ছাদিত। বিশাল মন্দির। চারিদিকে দশাবতার রয়েছেন, রয়েছেন আরও নানা দেব দেবী। গণেশজী তো আছেনই। চারিপাশে বিশাল বাজার। শাড়ী, গহনা, মশলা, খাবার, পশম, রেশম, কি সেখানে নেই? আমার শিবলিঙ্গের সংগ্রহে আর একটি স্ফটিকের শিবলিঙ্গ যুক্ত হল। সেটি যতক্ষন আমি স্বামী বিবিদিষানন্দজীকে না দেখাতে পারছি আমার শান্তি নেই। আমার সংগ্রহশালায় প্রথম শিবলিঙ্গ এসেছিল স্বামীজীর হাত দিয়ে। উনি আমাদের এই দুঃখ শোক সামলাতে অনেক সহায়তা করেছেন। কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তাঁকে ছোট করতে চাই না। তবে আজ চুপি চুপি বলে নিই আমার প্রথম শিবলিঙ্গ ফেভিকল দিয়ে জোড়া। দ্বিতীয় শিবলিঙ্গ পশুপতিনাথের। তিনি এখন Waiting Room-এ অপেক্ষা করছেন। জোড় খুলে গেছে। তাঁকে আর

রোজ স্নান করাতে ভরসা পাই না। মোটামুটি আমি জীবিত থাকাকালে একটি ছোটখাট শিবলিঙ্গের সংগ্রহশালা করে রেখে যাব যেটির তত্ত্বাবধান করতে গিয়ে আমার পুত্রবধূ আমার পিণ্ডদান করবে আর জল খাবে। পুত্রবধূকে ব্যস্ত রাখতে আমার Policy সম্ভবতঃ জনগণ সমর্থন করবেন।

শ্রীপ্রীতিকুমারের প্রয়াণের দিন ২৪শে নভেম্বর। তিনি গানবাজনা ভীষণ ভালবাসতেন, যার জন্য আমি এই বৃদ্ধ বয়সেও একটু আধটু গান করবার চেষ্টা করি। অবশ্য আমার জীবনে দু'টি গানই (গান /Gun) সমভাবে Applicable হয়েছে। এবার নীরেনদা অসুস্থ। আমাদের কলেজের নবাগত সহকর্মী শ্রীপার্থ মুখোপাধ্যায়কে অনুরোধ করেছি। পার্থ রাজী হয়েছে। পার্থর গান আমি শুনেছি। আমার বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানটি সার্থক ও সুন্দর করে তুলবে। আমি মানসচক্ষে দেখতে পাচ্ছি বাড়ীটা আলোয় ভরা। বাইরের ঘরে লোক ভর্ত্তি। পার্থ গান গাইছে। শ্রীপ্রীতিকুমার তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে খাটে শুয়ে হাসিমুখে পা দু'টি নাড়াচ্ছেন। মুখটা ভীষণ উজ্জ্বল।

কোনও পূর্বপুরুষকে কল্পনা করে কোনও শিশুর জন্মের পর লোকে বলে তিনি সংসারে ফিরে এসেছেন । সেইভাবে তাঁকে পালন করা হয়। শ্রীপ্রীতিকুমার বলতেন তিন বছরের আগে সাধারণতঃ কেউ পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন না। আর যে পরিবেশে থাকেন সেই পরিবেশে জন্মগ্রহণ করেন না। আমার মনে হচ্ছে শ্রীপ্রীতিকুমার যদি আমাদের কাছে ফিরে আসেন তাহলে কেমন হয় ? চিনে নিতে পারব কি ? দেখা যাক। তবে যে খাটনি খেটেছি তারপর আবার সেই রকম মিনিটে মিনিটে attend করা যাবে কি ? তবে এ বাড়ীতে আবার কোনও মহাপুরুষ জন্মালে বিপদ আছে। শ্রীপ্রীতিকুমারের মত popular লোক যদি আর একবার এ বাড়ীতে আসেন তাহলে হয়ে গেলো। আবার সেই চায়ের কাপ ! আবার সেই মিনিটে মিনিটে দরজা খোলা ! আবার সেই দেঁতো হাসি – কেমন আছেন? যাক সে চিন্তা আমার নয় ...... আমার নাতবৌয়ের .....। তখনও ২১১৬ খৃষ্টাব্দের দেরী থাকবে। **

__________ (** রচনাকাল – নভেম্বর, ১৯৯২)

ভারতের জাতীয় সঙ্গীত' 'জনগণমন অধিনায়ক'-এর জয়গাথা। 'জন' বা ব্যষ্টি, 'গণ' বা সমূহ এবং 'মন-অধিনায়ক' বা বিশ্বাতীত চৈতন্য - এই তিনের ত্রিত্ববাদ এই গানে স্বীকৃত। বিশ্বাতীত চৈতন্যের ইচ্ছা হয়েছিল বিশ্ব হবার, তাই বিশ্বাতীত এক এই বিশ্বে হলেন বহু। এই বহুরূপী অবস্থাটাই তাঁর গণরূপ।

তিনি যা নন, তা হতে পারার ক্ষমতা তাঁরই আছে। ছিলেন পরাচৈতন্য, হয়েছেন অপরা অচেতনা। ছিলেন সূক্ষ্ম, হয়েছেন স্থূল। এই পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদেন।

তিনি আবার নিজের স্বরূপে ফিরে যেতে চাইলেন। জগৎ-জোড়া জড়ের কোন কোন খণ্ডে ব্যষ্টির বিশিষ্টতা ব্যক্ত হল, - সমষ্টির অচেতনার মধ্যে আধো ঘুম আধো জাগা তন্দ্রাচ্ছন্ন প্রাণ জাগল। ব্যষ্টির মাধ্যমে এমনি ভাবে শুরু হল বিবর্তন। প্রাণীদের সমষ্টিতেও আবার কিছু কিছু ব্যক্তির তন্দ্রাচ্ছন্ন চেতনার মন জেগে গেল, ফলে বিবর্তনে মানুষ এল। এরপর বিজ্ঞানঘন সত্তা নিয়ে বিবর্তনের নতুন পর্যায় ফুটবে। এই পর্যায়টিই সচ্চিদানন্দ অবস্থার সঙ্গে সেতুবন্ধ রচনা করবে। দেহ, প্রাণ, মন, বিজ্ঞান, সৎ, চিৎ ও আনন্দ, - এই সাতটি পর্যায় পাড়ি দিচ্ছে ব্যষ্টি বা জীব।

বিশ্বাতীত, বিশ্ব ও ব্যক্তি, - ঈশ্বর, জগৎ ও জীব, - এই তিনই সত্য। ঈশ্বরের নিবর্তিত অবস্থাটা জগৎ এবং আবার স্ব স্ব রূপে ফিরে আসার ব্যবস্থাটা জীব। শ্রীকৃষ্ণের ভাষায় এই তিন হচ্ছেন পুরুষোত্তম, অক্ষর এবং ক্ষর। যীশুর ভাষায় তাঁরা হোলিঘোষ্ট, ফাদার এবং সন বা অমৃতের পুত্র।

যেহেতু ব্যষ্টিই হচ্ছে বিবর্তনের মাধ্যম, সেইহেতু ব্যষ্টিকে পঙ্গু করলে অগ্রগতিও স্তব্ধ হবে। এই জন্যই সমষ্টি বিশ্বে ব্যষ্টি ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করতে হয়েছে। আবার সমষ্টি ভারতে পাঞ্জাব, সিন্ধু, গুজরাট, মারাঠা, দ্রাবিড়, উৎকল, বঙ্গ

প্রভৃতি প্রান্তীয় বৈশিষ্ট্যগুলিকে মর্যাদা দেবার কথা ঘোষিত হয়েছে। আবার এই প্রান্তীয় জনতার মধ্যেও প্রতিটি জনকে বিশেষ মূল্যে স্বীকার করা হয়েছে এই জাতীয় সঙ্গীতে।

মনে রাখতে হবে, সুস্থ ব্যষ্টিত্ব সমষ্টির সঙ্গে ওতপ্রোত। ভারতের প্রান্তীয় বৈশিষ্ট্যগুলি এমনি ভাবেই বিন্ধ্য, হিমাচল, যমুনা, গঙ্গা ও জলধির সূত্রে সমষ্টিতে সংগ্রথিত। সমষ্টিকে উন্নততর পর্যায়ে উন্নীত ও বিবর্তিত করার জন্যই ঈশ্বরের এই ব্যষ্টি-লীলা।

অবশ্য ব্যষ্টির বিপরীত লীলাও আছে, - সেগুলোকে শত্রুভাবে সাধনা বলতে পারি। এ যেন নিরাকৃত হবার জন্যই ব্যাধির প্রকট হওয়া। দেহের পর্যায়ে যারা পড়ে আছে তারা জনতার অভিমানে পিশাচ চেতনা নিয়ে আসবে, - প্রাণের পর্যায়ে লগ্ন যারা, তারা কামনা-সর্বস্ব রাক্ষসী চেতনা নিয়ে আসবে, - মনের পর্যায়ে মতবাদের মানস কূটে যারা আবদ্ধ তারা আত্মম্ভরিতার আসুরিক চেতনা নিয়ে আসবে। বিভিন্ন পর্যায়ের এই সমস্যাগুলি আসবে সমাধানের গরজ জাগিয়ে দেবার জন্যই। কবন্ধ পিশাচ, রাবণ রাক্ষস ও তাড়কা অসুররা আঘাত হানে রাম-লক্ষ্মণদের সুপ্ত দেবত্বকে উন্মোচিত করার জন্য। ইতি রূপকে প্রকাশিত করার জন্যই তো নেতিরূপের খেলা।

স্বাধীনতা সংগ্রামকালে ভারতের জাতীয় সঙ্গীত ছিল বন্দেমাতরম্ গান। সেই গানে ঈশ্বর যে শক্তিবলে ঈশ্বর, যে শক্তি বলে বিশ্ব এবং যে শক্তি বলে জীব - সেই শক্তিকেই মা বলা হয়েছে। ঈশ্বর পর্যায়ে সেই শক্তি 'মা যা ছিলেন'; বিশ্বে নিবর্তিত পর্যায়ে সেই শক্তি 'মা যা হইয়াছেন'; আবার স্ব-স্বরূপে বিবর্তনের পর্যায়ে সেই শক্তিই 'মা যা হইবেন'। অতীত ভারত, বর্তমান ভারত ও ভবিষ্যৎ ভারতের প্রসঙ্গে এই সত্যটির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলেও সেই সূত্রে এই সার্বভৌম ব্যঞ্জনাই দেওয়া হয়েছে। তা সত্ত্বেও এইটি যে বিশেষভাবে ভারতেরই জাতীয় সঙ্গীত

তারও সংকেত রয়েছে এই গানে। কেননা ‘সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং’ বলতে ভারত ছাড়া আর কোন ভূখণ্ডকে বোঝায় না। দক্ষিণের বিশাল জলধির তপস্যার সুফল এই ভূমি, দক্ষিণা বাতাসের শীতল করা এই ভূমি যে ভারতবর্ষ তা বুঝতে কষ্ট হয় না।

শস্যে সবুজ আমাদের দেশ মাতৃকার ওপর জ্যোৎস্নার শ্বেতশুভ্রতা, সেই জ্যোৎস্নাকেও ছাপিয়ে ফুল্লকুসুমিত জাফরানি রঙ অশোক শাখা। এ যে আমাদেরই বৈশাখী নববর্ষের শুক্লপক্ষের ছবি। আমাদের জাতীয় পতাকার তিনটি রঙের সঙ্গে বঙ্কিমের এই ত্রিবর্ণ কল্পনার অপূর্ব মিল ঘটেছে। ‘ফুল্ল কুসুমিত দ্রুমদল’ বলতে অশোক গাছই বোঝায়, কেননা নির্দিষ্ট দ্রুম দল হচ্ছে অশ্বত্থ, বট, বেল, আমলকী ও অশোকের পঞ্চবটী এবং এর মধ্যে ফুল্ল কুসুমিত তরু একমাত্র অশোকই।

এই ভারত ভূখণ্ড তো অজ্ঞাত কুলশীল নয়। ঈশ্বর পর্যায়ে তিনি ছিলেন সচ্চিদানন্দময়ী বা সুহাসিনীং; বিজ্ঞান-প্রজ্ঞান পর্যায়ে তিনি প্রকট হয়েছেন, ভাষা পেয়েছেন, সুমধুর ভাষিনীং হয়েছেন; মনোময় পর্যায়ে তিনিই সন্তোষ বা সুখদাং; প্রাণময় পর্যায়ে তিনি বাঁচার ও বেড়ে ওঠার বরাভয় বা বরদাং। বর্তমানে এই দেশমাতৃকা রয়েছেন জড়লোকে। এই তো ‘মা যা হইয়াছেন’। জাত হওয়ার চক্রকেই বলে সম্ভূতি চক্র। জাতীয় পতাকায় চক্রচিহ্ন যে ভাবেই আসুক না কেন, বঙ্কিমের ধ্যানের সঙ্গে তা অপূর্বভাবে মিল ঘটিয়েছে। সচ্চিদানন্দময়ী সৎকোটি চিৎকোটি ও আনন্দকোটী, - এই তিন পরম্পরায় বিহার করছেন। তার সঙ্গে প্রজ্ঞানকোটি, মনোময় কোটি, প্রাণময় কোটি এবং জড়কোটি নিয়ে এই সপ্তকোটিতে এই মহাশক্তির করাল কণ্ঠ নিনাদিত। এমনি ভাবেই তিনি নিজেকে জড়ের করাল গ্রাসে নিবর্তিত করেছেন। এই সপ্তকোটি সপ্তলোক, - গণিতের কোটি নয়।

প্রতিটি ব্যষ্টির ভাণ্ডেই ব্রহ্মাণ্ডের এই সপ্তলোক নিহিত। ব্যষ্টিরা এই পর্যায়ে পাড়ি দিয়ে আবার উজিয়ে উঠছে উৎসতে, সেই দেবত্বে। এর নামই তো বিবর্তন। প্রতি কোটি বা প্রতি স্তরে জীবের শক্তির দুইটি ভূজ নিম্ন স্তরের বন্ধন ছিন্ন করার

কাজে নিযুক্ত। জড়ের করাল গ্রাসে নিবর্তিত বলেই সেই শক্তি তো ‘অবলা’ নয়।

তিনি বহুবলধারিনী, পরাবল ও অপরাবল দুই-ই তো তাঁর শক্তি। ইনিই অপরাবল হয়ে আঘাত হানছেন পরাবলে সম্বিত জাগানোর জন্য। এই দুই বলের মধ্যে পরাবলেই আমাদের সমুত্থান, এই ত্রাণকারী শক্তিকেই আমরা প্রণাম জানাই, ‘নমামি তারিনীং’। ইনিই দেহ-প্রবল পৈশাচিক রিপু, প্রাণ-সর্বস্ব রাক্ষসী রিপু এবং মানস-কূট সর্বস্ব আসুরিক রিপুদের নিবারণ করে সমুত্থান ও বিবর্তনকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন।

হে সচ্চিদানন্দময়ী পরাবিদ্যা,- তুমিই প্রবজ্ঞায় সব ধারণ করার ধর্মশক্তি, সেই তুমি আছ হৃদয়ের চৈত্য মণ্ডলে। আমার তুমিই মন, তুমিই প্রাণ এই শরীর মণ্ডলে। শরীর মণ্ডলে তুমি শক্তি, হৃদয়ের চৈত্য মণ্ডলে তুমিই ভক্তি, প্রতিটি ব্যক্তির জীবন মন্দিরে তোমারই প্রতিমা রচনা করি। শরীরের মণ্ডলে মনোময় স্তরে তুমি দশভূজা দুর্গা, প্রাণময় স্তরে তুমি পদ্মাসনা কমলা, দেহের পেশী সংস্থানে তুমি কারিগর তুমিই বিদ্যাময়ী বাণী। হৃদয়ের মণ্ডলে সচ্চিদানন্দময়ী ও প্রজ্ঞাময়ী তোমাকেও প্রণতি জানাই, নমামি ত্বং। কোনো মূর্ত্তি গড়ে তাতে ফুল বেলপাতার অঞ্জলি দেবার কথা এখানে বলা হচ্ছে না। ব্যষ্টির ভাণ্ডে সপ্ত কোটিতে যে শক্তি পরম্পরা রয়েছেন তাঁদেরই বোধন করা হচ্ছে এই মন্ত্রে। এক দেবতার মতো বহু এঞ্জেলের এই শক্তিগুলি সর্বত্রই স্বীকৃত। এই প্রার্থনা মন্ত্র উচ্চারণে কারো তো বাধা নেই।

বন্দেমাতরম সঙ্গীতের শেষাংশে আবার বিশেষ করে ভারতেরই প্রার্থনা। বলা হচ্ছে, -- যে তুমি মানস সরোবরে কমলবনবিহারিনী, হিমাদ্রীর অমল তুষারবরণী, অতুলনীয় হিমালয়ের উচ্চতা স্বরূপিনী, - সেই কমলা অমলা অতুলাকে প্রণাম করি। হিমালয় দিয়ে তিনি যেমন চিহ্নিতা, তেমনি ভাবে তিনি তো সাগর

দিয়েও চিহ্নিতা। তাই প্রণাম করি দক্ষিণ জলধির তপস্যার সুফল এই ‘সুজলা সুফলা’ মাকে।

এই সঙ্গীতের সর্বশেষ মন্ত্রে ভারতের কৃত্য ঘোষণা। এই শস্য শ্যামলা ভারতমাতা স্বাধীন ও ঐক্যবদ্ধ হয়ে ‘সবলা’ থাকুক। তার আশেপাশের মৈত্রী ভাবাপন্ন ‘সুস্মিতা’ ভূখণ্ডের সঙ্গে মৈত্রীবদ্ধ, পরিবেষ্টিত ও ‘ভূষিত’ হোক; এই মৈত্রীর পরিমণ্ডলে সমগ্র ধরণীকেই ভারত গ্রহণ করুক, ‘ধরনীং ভরনীং’ হোক আমাদের ভারতমাতা।

স্বাধীনতার সংগ্রামকালে বন্দেমাতরম সঙ্গীত যথেষ্ট পাওয়া হয়েছে; স্বাধীনতার পর ‘জন গণ মন-অধিনায়ক এর জয় গাথা ক্রমাগত গাওয়া হচ্ছে ; কিন্তু এই গান দুটির তাৎপর্য্য কি আমাদের কাছে ধরা পড়েছে ? এই গান দুটির গভীরতায় অবগাহন করতে পারলে এই জাতির নবজন্ম ঘটে যায়, - এ গান দুটির ভাণ্ডারে এত শক্তি সংরক্ষিত আছে।

পরম পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ - কঠোপনিষদের আলোকে

শ্রী পুরঞ্জনপ্রসাদ চক্রবর্তী

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব সর্বব্যাপী পরমতম আনন্দের বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন মানুষের অন্তরে রসাশ্রিত গল্প, উপমা ও উদাহরণের মাধ্যমে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে বলা হয় ‘সর্বধর্মস্বরূপ’। তিনি বিশ্বের সমস্ত ধর্মমতকে স্বীকার করে নিয়ে বললেন, ‘যত মত তত পথ’। ধর্মের জগতে তিনি প্রবর্তন করলেন সর্বধর্মের সমন্বয়। তিনি ঘোষণা করলেন যে, যে কোন ধর্মের মধ্য দিয়েই মুক্তিলাভ সম্ভব। তার বাণী পরমত সহিষ্ণুতার বাণী। ধর্মের নামে সংকীর্ণতা কিংবা সাম্প্রদায়িকতার স্থান নেই তাঁর কাছে।

পারমার্থিক সত্য এক অদ্বৈত সত্ত্বা যাঁকে ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান ইত্যাদি অনেক নামেই অভিহিত করা হয়ে থাকে। অধিকারীর কিংবা রুচির বিভিন্নতা অনুসারে সেই 'একম্ অদ্বৈতম্'-কে যিনি যেরূপভাবে উপলব্ধি করেছেন তিনি সেইরূপ ভাব ব্যক্ত করে ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়েছেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব স্বয়ং বিভিন্ন মত ও পথে সাধন ভজন করে একথাই প্রমাণ করলেন যে, সব সাধকগণই একই সত্যে গিয়ে পৌঁছান। 'অদ্বৈত জ্ঞান আঁচলে বেঁধে তোদের যা ইচ্ছা তাই কর' - এটাই ছিল ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শ্রীমুখ নিঃসৃত অমৃতময় বাণী। স্বামী বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণদেবকে 'নির্গুণ সগুণ নিরঞ্জন জগদীশ্বর' বলে আরতি করেছেন। স্তব করতে গিয়ে তিনি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে সম্বোধন করেছেন, 'হে দীনবন্ধো ! তুমিই জগতের একমাত্র প্রাণ্যবস্তু। আমি তোমার শরণাগত। ত্বমেব শরণং মম দীনবন্ধো!' স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্ববাণীতে উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে বললেন, 'ঠাকুর রামকৃষ্ণ হচ্ছেন অবতার শ্রেষ্ঠ। তাঁকে শরণ করাই আমাদের একমাত্র কর্তব্য।' তাই ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের স্তবে ধ্বনিত হলো বিশ্ববাণীর মন্ত্র -

'ওঁ স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্ম স্বরূপিণে।
অবতারবরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ।।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব গীতা, উপনিষদ, বেদ, শ্রীমদ্ভাগবত ইত্যাদি হিন্দুধর্মের যেসব সদ্গ্রন্থ আছে-সেগুলো থেকে গল্প, উপমা, উদাহরণ ইত্যাদি চয়ন করে নিয়ে রসাশ্রিত করে পরিবেশন করেছেন - তিনি কখনো দুর্বোধ্য তাত্ত্বিক আলোচনা করতে চাননি। শ্রীরামকৃষ্ণদেব ছিলেন অমৃতরসের রসিক। তিনি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য এবং মহৎ প্রজ্ঞা নিয়ে আপামর জনসাধারণের কাছে তুলে ধরেছিলেন ধর্মের সহজতম পথ। ভাষার লালিত্যে, বলার ভঙ্গীতে, দুরূহকে সহজ করার ক্ষমতায় শ্রীরামকৃষ্ণদেব ছিলেন অদ্বিতীয়-অনন্য-একক।

এখন কঠোপনিষদের সারাংশ আলোচনা করে দেখা যায় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব কত সহজ উপায়ে, কত বিচিত্র ব্যঞ্জনায় এই উপনিষদের ভাবধারা

প্রকাশ করেছেন। উপনিষদ সমূহের মধ্যে কঠোপনিষদের একটি বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে; কারণ এই উপনিষদে আত্মার স্বরূপ অতি প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে। কঠ উপনিষদ কৃষ্ণযজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয় শাখার কঠ বা কাঠক ব্রাহ্মণের অন্তর্গত বলে এই উপনিষদের এইরূপ নামকরণ হয়েছে। এই উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যার স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে একটি আখ্যায়িকার অবতারণা করা হয়েছে। সেই আখ্যায়িকাটি হল যম ও নচিকেতার কাহিনী। ঋষি বাজশ্রবস এক বিশেষ যজ্ঞ করেছিলেন, সেই যজ্ঞের নাম বিশ্বজিৎ। কিন্তু দানের জন্য যেসব গাভী আনা হয়েছিল সেগুলো ছিল অস্থিচর্মসার। ঋষি পুত্র নচিকেতা তা লক্ষ্য করে পিতাকে প্রশ্ন করেছিলেন যে, তিনি কার উদ্দেশ্যে নচিকেতাকে দান করেছেন। যাজ্ঞিকের প্রিয়বস্তু দান করাই ছিল এই যজ্ঞের রীতি। নচিকেতা বারবার একই প্রশ্ন করাতে পিতা বিরক্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত বলে উঠলেন, "ঠিক আছে, তোমাকে মৃত্যুর রাজা যমের উদ্দেশ্যে দান করলুম।" নচিকেতা পিতাকে প্রতিজ্ঞা পালনের অনুরোধ জানিয়ে একদিন সত্যি সত্যিই যমালয়ে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেখানে যমের নিকট থেকে তিনি তিনটি বরলাভের প্রতিশ্রুতি পেলেন। প্রথম বরে তিনি চাইলেন যে, পিতা যেন মৃত্যুলোক থেকে প্রত্যাগত পুত্রকে চিনতে পেরে আনন্দে বরণ করে নেন। দ্বিতীয় বরে তিনি স্বর্গলাভের সাধনভূত অগ্নিবিদ্যা প্রার্থনা করলেন। তৃতীয় বরে নচিকেতা আত্মার স্বরূপ জানতে চাইলেন।

আত্মতত্ত্ব সহজে বোধগম্য নয় বলে যম নচিকেতাকে এই তত্ত্ব জানাতে প্রথমে নানাপ্রকার আপত্তি তুললেন। এই বর লাভের যোগ্যতা নচিকেতার আছে কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য যম তাঁকে অনেক প্রলোভন দেখালেন। কিন্তু নচিকেতার দৃঢ় প্রত্যয় লক্ষ্য করে যম শেষ পর্যন্ত তাঁকে আত্মতত্ত্ব সম্পর্কে উপদেশ দিতে সম্মত হলেন।

আত্মতত্ত্ব সম্পর্কে উপদেশ দিতে গিয়ে যম প্রথমে নচিকেতাকে বললেন যে, সংসারে আসক্ত লোকেরা অজ্ঞানের ঘনীভূত অন্ধকারে স্ত্রী পুত্র পরিজন নিয়ে

বিভিন্ন তৃষ্ণাপাশে আবদ্ধ থাকে। বদ্ধজীব মনে করে যে, এসবই শ্রেয়র পথ। ফলে তারা সংসারের কুটিল আবর্তে ঘুরে বেড়ায়। তারা শ্রেয়র পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে সংসারের নানাবিধ দুঃখ ভোগ করে থাকে। কঠোপনিষদের প্রথম অধ্যায়ের ৩য় বল্লীর ৫৯ নং শ্লোকে আছেঃ

'যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবত্যযুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণ্যবশ্যানি দুষ্টাশ্বা ইব সারথোঃ।।

অর্থাৎ সংসারে আসক্ত মানুষের ইন্দ্রিয়গুলো যেন অশ্বের মতো এবং বিষয়ের প্রতি তাদের প্রবল আকর্ষণ। শ্রেয়র পথে পরিচালনা করার জন্যে তাদের ভাল সারথির ন্যায় নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। মন অসংযত হলে ইন্দ্রিয় দমন করা যায় না। ফলে ইন্দ্রিয়সমূহ উদ্দাম ও উচ্ছৃঙ্খল হয়ে ওঠে, জীবকে বিপথে পরিচালিত করে নানাবিধ পাপকার্যে লিপ্ত করায়। ফলে জীব সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মকে জানার চেষ্টা করতে পারে না।

আত্মাকে জানা যে সহজসাধ্য নয় – এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে যম নচিকেতাকে আরও বললেন যে, অজ্ঞানী লোকেরা দেহকেই 'আত্মা' বলে মনে করে; অথচ জ্ঞানী ব্যক্তিরা জানেন যে, জীবের দেহ আত্মা নয়। আত্মা দেহ থেকে আলাদা হলেও বিভিন্ন দেহে এক আত্মাই বিরাজমান। দেহ পরিবর্তশীল, কিন্তু আত্মার কোন পরিবর্তন নেই। পরমপুরুষার্থ লাভ করতে হলে ত্যাগের প্রয়োজন। আসক্তি ত্যাগই হলো প্রকৃত ত্যাগ। এটাই হলো শ্রেয়োলাভের মূল কথা।

সংসারে আবদ্ধ জীব যে কত কষ্ট পায় তবুও তাদের মন পড়ে থাকে কামিনীকাঞ্চনে। এই বিষয় সম্পর্কে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে কতভাবে কত বিচিত্র ভঙ্গীতে বলেছেন তার তুলনা হয় না। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের বিভিন্ন অধ্যায়ে এই অভিব্যক্তি প্রকাশিত হয়েছে। আমরা সেগুলো থেকে কিছু কিছু চয়ন করে নিয়ে একটু পর্যালোচনা করে দেখতে পারি। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বললেন, 'বদ্ধজীবেরা সংসারের কামিনীকাঞ্চনে বদ্ধ হয়েছে, হাত পা বাঁধা। আবার মনে করে যে,

সংসারের ঐ কামিনী ও কাঞ্চনেতেই সুখ হবে, আর নির্ভয়ে থাকবে। জানে না যে ওতেই মৃত্যু হবে। বদ্ধজীব যখন মরে তার পরিবার বলে, তুমি তো চললে, আমার কি করে গেলে? আবার এমনি মায়া যে প্রদীপটাতে বেশী সলতে জ্বললে বদ্ধজীব বলে, 'তেল পুড়ে যাবে সলতে কমিয়ে দাও।' এদিকে মৃত্যু শয্যায় শুয়ে রয়েছে।' রামকৃষ্ণদেব আবার এক বিস্ময়কর উদাহরণ দিয়ে বললেন, 'কাঁটা ঘাস খেয়ে উটের মুখ দিয়ে দরদর করে রক্ত ঝরে। তবুও উট আবার কাঁটা ঘাস খায়'। আবার পরম পুরুষের অনবদ্য উপমা, সংসার যেন বিশালাক্ষীর 'দ'। নৌকো একবার দহে পড়লে আর রক্ষে নেই। সেঁকুল কাঁটার মত একবার ছাড়ে তো আরেকবার এসে জড়ায়'।

কঠ উপনিষদে যম নচিকেতাকে আত্মা সম্পর্কে উপদেশ দিতে গিয়ে বললেন যে, আত্মা সহজে দর্শনীয় নয়। অনেক সাধনার দ্বারা তাঁকে লাভ করতে হয়। আমরা চোখ দিয়ে বাহ্য বস্তুকে যেভাবে দেখি আত্মাকে সেভাবে প্রত্যক্ষ করা যায়না। দীর্ঘদিন ধরে সাধনা করার পর বুদ্ধি নির্মল হলে আত্মার জ্ঞান প্রতিভাত হয়। আত্মা এক অদ্বিতীয় অপরিবর্তনীয় চিন্ময় সত্তারূপে অবস্থিত। কাষ্ঠে যেরূপ অগ্নি গোপন অবস্থায় আছে, সেইরূপ তিনি সব বস্তুতেই প্রচ্ছন্ন অবস্থায় আছেন। কেবলমাত্র অধ্যাত্ম যোগের অভ্যাস দ্বারাই আত্মাকে লাভ করা যায়। কঠ উপনিষদের ১ম অধ্যায়ের ২য় বল্লীর ৫২নং শ্লোকে আছে -

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুংস্বাম।।

এর ভাবার্থ হল - উত্তমরূপে বেদাধ্যয়ন দ্বারাই এই মহান আত্মাকে জানা যায় না। চিন্তাশক্তি এবং যুক্তিতর্ক দ্বারাও তাঁকে পাওয়া যায় না। এই আত্মা যাঁকে বরণ করেন তিনিই তাঁকে লাভ করতে পারেন। তাঁর নিকটেই আত্মা স্বীয় তনু অর্থাৎ নিজের স্বরূপ মহিমা ও ঐশ্বর্য প্রকাশ করে থাকেন। এই আত্মা চৈতন্যস্বরূপ। তিনি কাউকেই হনন করেন না, আবার কারো দ্বারা হতও হন না। আত্মা অনাসক্ত, নির্লিপ্ত ও কর্তৃত্বাভিমানশূন্য। বিশ্বের অসংখ্য জীবের দেহে যে আত্মা বাস করেন সেই আত্মা

এক এবং অদ্বিতীয়। দেহ ধ্বংসশীল, কিন্তু দেহে অধিষ্ঠিত আত্মা স্থায়ী ও নিত্য। তিনি শাশ্বত এবং চিরন্তন। সেই মহান আত্মাকে কিভাবে লাভ করা যায় এই প্রসঙ্গে কঠ উপনিষদের প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় বল্লীর ৬৮নং শ্লোকে বলা হয়েছে -

'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান নিবোধত।

ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তাৎ কবয়ো বদন্তি।।'

এর ভাবার্থ হল - 'হে জীবগণ! তোমরা ওঠ, জাগো - আত্মজ্ঞানাভিমুখী হও। উচ্চ জ্ঞান ও উন্নত জীবনযাপনের জন্য সচেষ্ট হও। শ্রেষ্ঠ আচার্যগণের নিকট উপস্থিত হয়ে আত্মার সম্যক জ্ঞানলাভের জন্য চেষ্টা কর। অবশ্য এই আত্মজ্ঞান লাভের পথ খুবই দুর্গম। ক্ষুরের তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ যেমন দুরতিক্রমনীয়, তত্ত্বজ্ঞান লাভের পথও সেইরূপ দুর্গম। সুতরাং তত্ত্বজ্ঞানার্থীকে দৃঢ়চিত্ত হয়ে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে এগিয়ে যেতে হবে।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব একজন তত্ত্বদর্শী। উপনিষদের সমস্ত তত্ত্বই তিনি সাধনার দ্বারা লাভ করেছেন। আর নিজের সাধনালব্ধ অভিজ্ঞতা থেকে উপদেশ দিয়েছেন বলে সেগুলো অনেক বেশী রসাশ্রিত ও ব্যঞ্জনাময় হয়ে উঠেছে। এইখানেই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের স্বকীয়তা। এখানেই তিনি অনন্য। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মতে জীব নিত্যমুক্ত। জীব নিজেকে বদ্ধ বলে মনে করে বলে সে দুঃখ পায়। এর কারণ জীবের অজ্ঞতা। জীব আত্মবিস্মৃত। সে নিজের পরিচয় জানে না। জীব যদি কতকগুলো 'পাশ' থেকে মুক্ত হতে পারতো, তবে সে 'শিব' হিসাবে উন্নীত হতে পারতো। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব এক সরস গল্পের মাধ্যমে জীবের স্বরূপ ব্যাখ্যা করলেন। গল্পটি উপনিষদ থেকেই নেওয়া একটি জনপ্রিয় গল্প। গল্পটি এই রকম - এক বাঘিনী একবার ছাগলের পাল আক্রমণ করলে একজন ব্যাধ সেটিকে তীরবিদ্ধ করে মেরে ফেলে। মরে যাবার আগে বাঘিনীটির একটি বাচ্চা হয়। সেই বাচ্চাটি ছাগলগুলোর সঙ্গেই বড় হতে থাকে। একটু বড় হয়ে ব্যাঘ্র শাবকটি ছাগলগুলোর মতোই ঘাস খায় আর 'ভ্যা ভ্যা' করে ডাকতে থাকে। একদিন একটা ভয়ঙ্কর বাঘ ছাগলগুলোকে

আক্রমণ করতে গিয়ে দেখে একটা বাঘের বাচ্চাও ছাগলগুলোর সঙ্গে ঘাস খাচ্ছে। বাঘটি তখন ছাগলগুলোকে না ধরে সেই ঘাস খেকো বাঘের বাচ্চাটিকে ধরলো। সেটিকে একটা জলাশয়ের ধারে টেনে এনে বাঘটি বললো, 'এই জলের ভেতর তোর মুখ দেখ। চেয়ে দেখ তুইও যা আমিও তা। রামকৃষ্ণদেব গল্পটির ব্যাখ্যা দিয়ে বললেন যে, ঘাস খাওয়া হচ্ছে সংসারে কামিনী কাঞ্চন নিয়ে থাকা, ছাগলের মত 'ভ্যা ভ্যা' করে ডাকা হচ্ছে সাধারণ জীব যেভাবে আচরণ করে তা করা। আর বাঘ হচ্ছেন গুরু - যিনি চৈতন্যের পথে নিয়ে যান। আর নিজের মুখ দেখা হচ্ছে নিজের স্বরূপকে জানা। জীবের কর্তব্য হচ্ছে, কামিনী কাঞ্চনের মায়া পরিত্যাগ করে আত্মোপলব্ধিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠা।

চিত্তশুদ্ধি না হলে আত্মাকে লাভ করা যায় না। মুখে ঈশ্বরের কথা আর অন্তরে কামিনী কাঞ্চনের চিন্তা থাকলে ঈশ্বরের কৃপা লাভ করা যায় না। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব একটি উদাহরণ দিয়ে বললেন, 'সূচ যদি কাদা দিয়ে ঢাকা থাকে তবে চুম্বকে আকর্ষণ করে না। মাটি কাদা ধুয়ে ফেললে তবে চুম্বকে আকর্ষণ করে'। আমাদের মনের ময়লাও তেমনি চোখের জলে ধুয়ে মুছে ফেলতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবার অপূর্ব সুন্দর দৃষ্টান্ত, 'হাতি অন্যের কলাগাছ খেতে শুঁড় বাড়ালে মাহুত ডাঙশ মারে'। ভোগ থাকলেই যোগ কমে যায়। যখনই ভোগের দিকে মন যেতে চাইবে তখনই ডাঙশ মেরে ইন্দ্রিয়গুলোকে সংযত করতে হবে। এ সম্পর্কে আবার মনোরম একটি চিত্র আঁকলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব - 'এক চাষী তার ক্ষেতে জল সিঞ্চন করছে। সারাদিন জল সেচ করে সন্ধ্যার সময়ে সে মনে করলো, একবার দেখে আসি জমিটা কতটুকু ভিজলো'। এসে দেখে, আলের মধ্যে একটা গর্ত দিয়ে সব জল বেরিয়ে গেছে। এক ছটাক জমিও ভেজেনি। এই গর্ত আর কিছুই নয়, সংসারী লোকের বিষয়বুদ্ধির গর্ত। অনবরত জপ তপ করছি, কিন্তু কই, সেরকম চিন্তা করতে গিয়ে পদে পদে যে বিষয় বুদ্ধির চিন্তা করছি তার হিসাব রাখছি কোথায় ? ফলে আমাদের চিত্তশুদ্ধি ঘটে না। রামকৃষ্ণদেব আরও বললেন

'ধোঁয়া দেয়াল ময়লা করে কিন্তু আকাশের কিছুই করতে পারে না'। আমরাও আকাশের মতো উঁচু ও নির্মল হবো। সংসারে কামিনী কাঞ্চন আর পাপের মধ্যে বাস করলেও কোন প্রকার মালিন্য যাতে আমাদের স্পর্শ করতে না পারে সেই আকুল আর্তিই রাখবো পরম মঙ্গলময়ের কাছে।

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের কণ্ঠ থেকে কঠ উপনিষদের ঋষিদের ন্যায় উচ্চারিত হল, 'এক আনন্দময় সত্তা অধিষ্ঠিত রয়েছেন আমাদের অন্তরে - তিনিই আত্মা'। রামকৃষ্ণদেব বললেন, 'হরিণের নাভিতে কস্তুরী থাকে – তা জানে না হরিণ। গন্ধে দশদিক আমোদিত হয় দেখে উন্মনা হয়ে ছুটে বেড়ায় হরিণ। অথচ নিজের নাভির মধ্যেই যে সুগন্ধের উৎস - একথা কে তাকে বলে দেবে'? আবার অপূর্ব উদাহরণ দিয়ে বললেন রামকৃষ্ণদেব, 'মাথায় মাণিক রয়েছে, তবু সাপ ব্যাঙ খেয়ে মরে'।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব আমাদের শুনালেন 'অভীঃ' মন্ত্র। তত্ত্বজ্ঞান লাভের পথ ক্ষুরের তীক্ষ্ণ অগ্রভাগের ন্যায় দুরতিক্রমণীয় হলেও তিনি আমাদের নিরাশ করেননি। ঠাকুরের উপদেশ - হতাশ হয়ো না। এগিয়ে যাও। চরৈবেতি। চরৈবেতি। শুধু এগিয়ে যাও। এই প্রসঙ্গে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের এক অনবদ্য গল্প - কাঠুরিয়ার গল্প। সাধনার মধ্য দিয়ে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পথে এগিয়ে যাবার গল্প। সাধন পথে রামকৃষ্ণদেব আমাদের শুধু এগিয়ে যাবার কথা বলেছেন। তবেই তো আমরা একদিন সত্যি সত্যি তাঁর অপূর্ব জ্যোতিচ্ছটা দেখতে পাবো। অসাধারণ আত্মবিশ্বাস, সংযম ও দুশ্চর তপস্যার মধ্য দিয়েই আমাদের আত্মিক উত্তরণ সম্ভব। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অমেয় অমৃতময় বাণীই আমাদের সেই পথের নির্দেশ দেবে। ওঁ নমো ভগবতে শ্রীরামকৃষ্ণায়।।

শ্রীশ্রীমা ও লক্ষ্মীদিদি — শ্রী প্রণব ঘোষ

লক্ষ্মীদিদি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ভাইঝি, মেজভাই রামেশ্বরের মেয়ে। লক্ষ্মীদিদির সংস্কার ছিল খুব উঁচু। মা শীতলা একদিন স্বপ্নে দেখা দিয়ে ঠাকুরকে বলেছিলেন, "আমি একরূপে ঘটে, অন্যরূপে তোমাদের লক্ষ্মীতে। লক্ষ্মীকে খাওয়ালেই আমাকে খাওয়ানো হবে।" কাশীপুরে তিনি লক্ষ্মীদিদিকে শীতলা জ্ঞানে দু'বার পুজো করেছিলেন। একবার গিরীশ ঘোষকে বলেছিলেন, "লক্ষ্মীকে মিষ্টিটিষ্টি একদিন খাইয়ো, তাহলে মা শীতলাকে ভোগ দেওয়া হবে। তাঁরই অংশ।"

লক্ষ্মীদিদি ছিল সারদা মার নিত্য সঙ্গী। কামারপুকুর ও দক্ষিণেশ্বরে দুজনে সর্বদা একত্রেই থাকতেন। দুজনে লেখাপড়াও শিখেছিলেন একত্রে। মা বলেছেন, "কামারপুকুরে লক্ষ্মী আর আমি বর্ণপরিচয় একটু একটু পড়তুম। ভাগনে (হৃদয়) বই কেড়ে নিলে, বললে 'মেয়েমানুষের লেখাপড়া শিখতে নেই, শেষে কি নাটক নভেল পড়বে'? লক্ষ্মী তার বই ছাড়লে না। ঝিয়ারী মানুষ কি না, জোর করে রাখলে। আমি আবার গোপনে আর একখানি একআনা দিয়ে কিনে আনলুম। লক্ষ্মী গিয়ে পাঠশালায় পড়ে আসতো। সে এসে আবার আমায় পড়াত। শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়েছিল দক্ষিণেশ্বরে। ঠাকুর বাগানের পীতাম্বর ভাণ্ডারীর এগার বছরের ছেলে শরৎ ভাণ্ডারীকে বলেছিলেন, 'তুই লক্ষ্মীকে ও তার খুড়ীকে প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ পড়িয়ে দে'। এই দুই ভাগ শেষ হলে ঠাকুর বলেছিলেন, "আর লেখাপড়া শিখতে হবে না। এখন রামায়ণাদি ধর্মপুস্তক বেশ পড়তে পারবে।"

মা ও লক্ষ্মীদিদি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের এক বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর কাছ থেকে দীক্ষা নিয়েছিলেন। সন্ন্যাসী বেশ মোটাসোটা, শান্ত ও সুপুরুষ ছিলেন – নাম পূর্ণানন্দ। উনি কামারপুকুরে গিয়েছিলেন। তারপর যা করণীয় ঠাকুরই করেছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর একবার মার জিভে কিছু একটা লিখে দিয়েছিলেন। মা পরদিন লক্ষ্মীদিদিকে বললেন, "কাল তিনি আমার জিভে লিখে দিয়েছেন; তুইও যা না।"

সেই কথা শুনে লক্ষ্মীদিদি ঠাকুরের কাছে গেলে ঠাকুর তাঁর জিভে রাধাকৃষ্ণের বীজ ও নাম লিখে দিয়েছিলেন লক্ষ্মীদিদি শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত জেনেও। ঠাকুর বলেছিলেন, "তা হোক, আমি ঠিক দিয়েছি।"

দক্ষিণেশ্বরে যখন মা ও লক্ষ্মীদিদি একসঙ্গে থাকতেন তখন ঠাকুর ভোররাত্রে শৌচে যাবার পথে নহবতের পাশে এসে ডাকতেন, "ও লক্ষ্মী ওঠ রে, ওঠ। তোর খুড়ীকে তোলরে। আর কত ঘুমুবি? রাত পোহাতে চলল। গঙ্গাজল মুখে দিয়ে মার নাম কর, ধ্যান জপ আরম্ভ করে দে ।" তখন মা ও লক্ষ্মীদিদির ঘুম পাতলা হয়ে এসেছে। কাজেই তাঁরা উঠে পড়তেন। তবে শীতের সময় ঠাকুরের সাড়া পেলে মা লক্ষ্মীদিদিকে আস্তে আস্তে বলতেন, "তুই চুপ কর, ওঁর চোখে ঘুম নেই। এখনও ওঠবার সময় হয়নি – কাক কোকিল ডাকেনি – সাড়া দিসনি"। সাড়া না পেয়ে অনেক সময় কৌতুক করে ঠাকুর দরজার নীচে জল ঢেলে দিতেন, তখন বিছানা ভিজবার ভয়ে তাঁরা তাড়াতাড়ি উঠে পড়তেন।

মা ও লক্ষ্মীদিদি ঠাকুরের কীর্তনাদি শুনতে ভালবাসতেন। কীর্তন শুরু হবার আগে ঠাকুর নহবতের দিকের দরজা খুলে দিতে নির্দেশ দিয়ে বলতেন, "এখানে কত ভাব ভক্তি হবে, ওরা সব (মা ও লক্ষ্মীদিদি) দেখবে না, শুনবে না? তবে কেমন করে শিখবে?" দরমার মধ্যে আঙ্গুল প্রমাণ ছিদ্র দিয়ে তাঁরা দেখতেন। ক্রমে সেই ছিদ্র বড় হয়ে গেছে লক্ষ্য করে ঠাকুর রহস্যচ্ছলে রামলাল দাদাকে বলেছিলেন, "ওরে রামনেলো, তোর খুড়ীর পরদা যে ফাঁক হয়ে গেল।"

কখনও কখনও ঠাকুর উচ্চ ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে মাকে উপদেশ দিতেন। মা ও লক্ষ্মীদিদির কাছে একদিন শ্রীকৃষ্ণের লীলা বর্ণনা করে ঠাকুর লক্ষ্মীদিদিকে বলেছিলেন, "আমার কাছে যা শুনলি, তোরা দুজনে বলাবলি করবি। গোরুগুলো দিনের বেলায় যা খায়, রাত্রে সেগুলো জাবর কাটে। তুই আর তোর খুড়ী দুজনে বলাবলি করবি, তাহলে শ্রীকৃষ্ণের এসব লীলাকথা আর ভুলে যাবি না – বেশ মনে

থাকবে।

১৮৭২ খ্রীঃ থেকে ১৮৮৫ খ্রীঃ পর্যন্ত লক্ষ্মীদিদি প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে থাকতেন। দক্ষিণেশ্বরে তিনি বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলী পাঠ করে ও গান গেয়ে মাকে শোনাতেন। নহবতের ক্ষুদ্র পরিসর ঘরে মা ও লক্ষ্মীদিদি অনেকটা খাঁচায় আটক পাখির মত বাস করতেন বলে ঠাকুর তাঁদের 'শুক সারী' বলে অভিহিত করতেন। শ্যামপুকুর ও কাশীপুরেও লক্ষ্মীদিদি মার সঙ্গে থাকতেন।

মহাপ্রয়াণের আগে ঠাকুর মাকে বলেছিলেন, "লক্ষ্মীকে একটু নজরে রেখো। সে করে খাবে – তোমাদের উপর ভার হবে না।" মা ঠাকুরের সে কথা অমান্য করেন নি। বৃন্দাবন ও পুরী ভ্রমণের সময় মা লক্ষ্মীদিদিকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। তারপর লক্ষ্মীদিদি কখনো কখনো মার সঙ্গে কামারপুকুরে বাস করতেন।

লক্ষ্মীদিদি ঠাকুরকে অবতার বলেই জানতেন; বলতেন, 'ঠাকুর অবতারী'। মা ও যে সাক্ষাৎ ভগবতী সে কথাও তিনি নিশ্চয় বুঝেছিলেন। বৈকুণ্ঠ নামে মায়ের জনৈক ভক্ত মাকে কামারপুকুরে দর্শন করতে যান। ভক্তের বিদায়কালে মা হঠাৎ বলে উঠলেন, "বৈকুণ্ঠ, আমায় ডাকিস"। পরমুহূর্তে তিনি আবার বললেন, "ঠাকুরকে ডেকো, ঠাকুরকে ডাকলেই সব হবে"। লক্ষ্মীদিদি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলে উঠলেন, "না মা, এ কি কথা? এতো তোমার বড় অন্যায়। ছেলেদের এমন করে ভোলালে তারা কি করবে? মা তখন বললেন, "কই, আমি কি করলুম"? দিদি বললেন, "মা, তুমি এই মুহূর্তে বৈকুণ্ঠকে বললে 'আমায় ডাকিস', আবার বলছো, 'ঠাকুরকে ডেকো'। তারপর লক্ষ্মীদিদি বৈকুণ্ঠকে বুঝিয়ে দিলেন, মার মুখ থেকে সেদিন যে কথা বের হল তা অত্যন্ত মূল্যবান। ওটা মায়ের মুখের স্বীকৃতি ও আদেশ। অতএব বৈকুণ্ঠ যেন মাকেই ডাকেন।

ভেলা বলতে মনে মনে আবার বেহুলা-লখীন্দরের দেশে পৌঁছে যাবেন না। ভেনিসের যে নৌকোয় আমরা ভেসেছি, তার নাম গন্ডোলা। ১১ মিটার লম্বা আর ১.৪ মিটার চওড়া এই রোমাঞ্চকর গন্ডোলা রাইডে ভিনিসিয় গন্ডোলিয়ারের গলায় "আ মোরে মিয়ো" শুনতে শুনতে এই খাল সর্বস্ব শহরে না ভাসলে ভেনিস ভ্রমণই অসম্পূর্ণ | আমার চোখে ভেনিস বলতে যে ছবিটা ভেসে উঠতো তা হলো মাকড়সার জালের মতো ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য খাল নিয়ে ছোট্ট এক শহর, যাকে দ্বিখণ্ডিত করেছে প্রধান এক খাল – গ্র্যাণ্ড ক্যানেল, যেখানে প্রতিটি বাড়ির ঘাটেই বাঁধা রয়েছে নিজস্ব পরিবহন ছোট্ট ডিঙি নৌকা, আর খালের দু'পাশ সংযুক্ত হয়েছে চমৎকার সব সেতুতে। বাস্তবে এই ৪১৪.৫৭ বর্গ কিলোমিটার শহরের ৬২.২ শতাংশ অর্থাৎ ২৮৩.৮৩ বর্গ কিলোমিটার গ্র্যাণ্ড ক্যানেল সমেত অন্যান্য খালের দখলে থাকলেও ১৫৬.৮৪ বর্গ কিলোমিটার স্থলভাগেই রয়েছে ভেনিস ঐতিহ্যের যাবতীয় নিদর্শন। আসলে উত্তর-পূর্ব ইতালির ভেনেতো অঞ্চলে অ্যাড্রিয়াটিক সাগরের লেগুনে ১১৮টি ছোট ছোট দ্বীপের সমষ্টি এই ভেনিস। দ্বীপগুলোকে সংযুক্ত করেছে অসংখ্য খাল আর তার ওপর তৈরি করা ৪৩৮ টি ব্রীজ। সবচেয়ে সুন্দর আর জমকালো অবশ্যই গ্র্যাণ্ড ক্যানেলের ওপর তৈরী রিয়ালটো ব্রিজ। এ' হেন জলের শহর ভেনিস – যা কিনা ভবিষ্যতে জলের তলাতেও তলিয়ে যাওয়া সম্ভব বলে মনে করা হচ্ছে, পৌঁছাতে পার হতে হয়েছিল অ্যাড্রিয়াটিকের ভগ্নাংশ। ওয়াটার বাসের সেই জলযাত্রাও কি কম সুন্দর? আমাদের যাত্রা অবশ্য শুরু হয়েছিল অস্ট্রিয়ার সুন্দর শহর ইন্সব্রুক থেকে । স্মাইলস পার মাইলসের হাত ধরে ১৩ দিনের ইউরোপ ভ্রমণে বেরিয়ে ২৪ জনের দলটা ইতিমধ্যে লণ্ডন, প্যারিস, সুইজারল্যান্ড, জার্মানী আর অস্ট্রিয়া ছুঁয়ে ফেলেছি। আগামী তিনদিনে এখন ইতালির অংশবিশেষ দেখার পালা। ইন্সব্রুক থেকে ভেনিস প্রায় ৩৮৫ কিলোমিটার দক্ষিণে। তবে মাখনের মতো রাস্তা আর ৫২ সিটের লং ডিস্টান্স লাক্সারি বাসে যাত্রী মাত্র ২৪ হওয়ায় চলায় শুধু

ছন্দই ছিলো, ক্লান্তি নয় । গত কয়েকদিনের মতো চলার পথের দৃশ্য প্রায় একই। চাকার তলায় চরম আধুনিকতার সাথে জানলার দু'ধারে সবুজ প্রকৃতি। সবুজের মাথায় মাঝে মাঝে বরফের উঁকিঝুঁকি থাকলেও ১৮৮৩ ফুট উচ্চতার ইন্সব্রুক থেকে মাত্র তিন ফুট উচ্চতার ভেনিসে নামার সময় বরফেরা টাটা করবেই। তবে ক্ষতিপূরণও ছিলো বই কি! সেটা ওই অ্যাড্রিয়াটিক সাগর। সেই সাগরপারের জাহাজঘাটায় আমাদের জন্য যে অপেক্ষা করছিল, সেই নাতালিয়া-ই ভেনিসে আমাদের পথপ্রদর্শক। এই পথপ্রদর্শক যে আমাদের পথে বসাতে পারে এমন ভাবনা কোনও দুঃস্বপ্নেও ছিলো না। বাস্তবে ঘটলো সেটাই। যে জলযানের ভরসায় আমরা অ্যাড্রিয়াটিক পাড়ি দেব, ঘাটে এসে তার কোন পাত্তাই পাওয়া গেলো না – সে যেন ওই জলেই মিলিয়ে গেছে। উদ্ধার করলো অবশ্যই ওই রাশিয়ান মেয়ে নাতালিয়াই। অন্তত আধঘন্টা ছোটাছুটির পর সে আমাদের অন্য আরেক ওয়াটার বাসে ভাসিয়ে দিল বটে, কিন্তু সময়সূচীর হেরফেরে গণ্ডোলাতেও যে গণ্ডগোল পাকিয়ে উঠেছে, সেটা পরে বুঝেছিলাম। জেটি থেকে আমাদের লক্ষ্য পিয়াজ্জা সান মার্কো বা সেন্ট মার্ক'স স্কোয়ার পৌঁছতে ২০-৩০ মিনিট লাগলেও দূরত্ব কিন্তু তিন কিলোমিটারের বেশি হবে না। বাধ্যতামূলকভাবে আমাদের ওয়াটার বাসের খোঁয়াড়ে পুরে দেওয়া হলেও প্রথমে অ্যাড্রিয়াটিক পরে গ্র্যাণ্ড ক্যানেলের জলে ভেসে চলার সময় থেকেই ভেনিস তার মায়াবী রূপ দেখাতে শুরু করে দিলো। বাস্তবে গণ্ডোলা রাইডের আগে কয়েক ঘন্টার দৌড়ে পা প্রায় খুলে আসার অবস্থা পর্যন্ত সেন্ট মার্ক'স স্কোয়ারে নাতালিয়া যা দেখিয়েছে তা কিন্তু একনজরে আমরা দেখে নিয়েছি ভিনিসিয় veporetto বা ওয়াটার বাসের ভিতর থেকেই। ভেনিস সম্পর্কে যতদূর জানা যায়, এখানে বাস করতো ভেনেতি মানুষজন খ্রীষ্টপূর্ব দশম শতাব্দী থেকে। পরবর্তীকালে, প্রায় এক সহস্রাব্দ, ৮১০ – ১৭৯৭ এই শহর ছিল রিপাবলিক অফ ভেনিসের রাজধানী। অর্থনৈতিক এবং সামুদ্রিক শক্তিতে বলীয়ান ভেনিসের বাণিজ্যিক জাহাজ ব্যবসার কারণে সিল্ক, শস্য আর মশলা নিয়ে পাল ওড়াত বন্দর থেকে বন্দরান্তরে। সাধে কি ১৬ শতকে সেক্সপীয়ার মার্চেন্ট অফ ভেনিসের মতো নাটক রচনা

করেছিলেন? ভুললে চলবে না ১৩ শতকের পর্যটক ও বণিক মার্কো পোলো ছিলেন এই ভেনিসেরই বাসিন্দা। ভেনিসের সার্বভৌমত্ব শেষ হয়ে যায় ১৭৯৭ সালে যখন ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়ন এই প্রজাতন্ত্রের ওপর বিজয় পতাকা ওড়ান। পরবর্তীকালে ১৮৬৬ সালে ভেনিস ইতালি রাজ্যভুক্ত হওয়ার পর থেকে পর্যন্ত তা সে দেশের অন্যতম প্রধান শহর। খাল-সর্বস্ব এই শহর যে কতখানি পর্যটক প্রিয় তা বুঝতে পারি যখন শুনি প্রতিদিনের ট্যুরিস্ট সংখ্যা এখানে ৬০,০০০ এর কম নয়।

আগেই যে পর্যন্ত সেন্ট মার্ক'স স্কোয়ার বা পিয়াজ্জা সান মার্কোর কথা উল্লেখ করেছি তা আসলে ভেনিসের প্রধান স্কোয়ার। এখানেই ক্লক টাওয়ার, বেল টাওয়ারের সাথে রয়েছে 'সেন্ট মার্ক'স ব্যাসিলিকা'। আনুমানিক ৮২৯ -৮৩৬ সালে নির্মিত ২৫১ ফুট দীর্ঘ এবং ২০৫ ফুট প্রস্থের এই চার্চের ভিতরের উচ্চতা ৯২.৪ ফুট হলেও বাইরের কেন্দ্রীয় গম্বুজ প্রায় ১৪১ ফুট। সেন্ট মার্ক'স স্কোয়ারের পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত এই চার্চ আসলে ভেনিসিয়ান রিপাবলিকানের তৎকালীন প্রধান ডোজ (DOGE)-এর প্রাসাদ সংলগ্ন। একাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ইতালির অনেক শহরই তাদের ক্যাথিড্রালগুলিকে বিশাল আকারে পুনর্নির্মাণ করে। বাদ যায়নি সেন্ট মার্ক'সও। ১০৬৩ সালে ডোজ ডোলেনিকো একে উল্লেখযোগ্য ভাবে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করলে প্যাটার্নযুক্ত খোদাই করা মার্বেল স্তম্ভ ও ভাস্কর্যের উপাদানে সেন্ট মার্ক'স ভেনিসের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ।

যে ডোজের প্রাসাদের কথা এই মাত্র উল্লেখ করা হয়েছে, ভেনিসের অন্যতম প্রধান নিদর্শন ভেনিসিয় গথিক শৈলীতে নির্মিত সে প্রাসাদে রয়েছে সরকারী অফিস, কারাগার এবং ভেনিস প্রজাতন্ত্রের নির্বাচিত কর্তৃপক্ষ ডোজের বাসভবন। ৮৯০ সালে নির্মিত এই প্রাসাদ পুনর্নির্মিত হয় ১৩৪০ সালে। পরবর্তী কালে নানান পরিবর্তনের পর ১৯২৩ সাল থেকে তা এখন ভেনিসের সরকারী যাদুঘর। কে এই ডোজ? নাতানিয়াকে প্রশ্ন করলেও জবাবটা ঠিক বোধগম্য হচ্ছিল না। আসলে সমস্যাটা ওর মাইক্রোফোন নিয়ে। জেটিতে আধ ঘন্টার ঝঞ্ঝাটে কোথাও সেটা

হারিয়ে ফেলে ওর অবস্থা যেন ঢাল-তলোয়ারহীন নিধিরাম সর্দার। গলাও অ-মাইক নয় যে হাজার ভিড়ের মাঝে তার কথা আমার কানের মধ্য দিয়া মরমে পশিবে। শেষে সবজান্তা গুগলভায়ার কাছে জানা গেল অষ্টম থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত যিনি ভেনিস প্রজাতন্ত্রের প্রধান নেতা হিসাবে নির্বাচিত হতেন, তিনিই ডোজ (Doge)। পাওলো লুসিও আনাফেস্টো, মার্শেলো টেগাল্লিয়ানোর মতো ডোজ-রা প্রায় হাজার বছর ভেনিস প্রজাতন্ত্রের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করার পর লুদোভিকো ম্যানিনের ডোজশিপের সময় দেশের স্বাধীনতা বিকিয়ে যায় নেপোলিয়ানের আগ্রাসনে। শেষ হয়ে যায় ভেনিসে ডোজশিপের জমানা।

ভেনিসের উচ্চতম স্থাপত্য, যাকে সাধারণ ভাবে ‘বেল টাওয়ার’ বলা হয়, আসলে এখানকার সেন্ট মার্ক’স ক্যাম্পানাইল বা সেন্ট মার্কের ব্যাসিলিকার ঘন্টা টাওয়ার। ৩২৩ ফুট টাওয়ারের উপর থেকে ভেনিসের যে প্যানোরামিক দৃশ্য দেখা যায়, তা এক কথায় লা-জবাব। ১৬০৯ সালে স্বয়ং গ্যালিলিও তাঁর টেলিস্কোপের ব্যাপার স্যাপার বোঝাতে তৎকালীন ডোজকে নিয়ে টাওয়ারের মাথায় চেপেছিলেন। অতীতকে দেখতে পাইনা বটে, তবে সে ঘটনার স্মরণে মূক-সাক্ষী ফলকটা তো আছে।

বেলটাওয়ার, ক্লক টাওয়ার সমেত সেন্ট মার্ক’স স্কোয়ারটা মনে আর মোবাইলে বন্দী হতে না হতেই নাতালিয়া আমাদের ছুটিয়ে মারছিল এক গন্ডোলার ঘাট থেকে অন্য এক গন্ডোলিয়ারের ঘাটে। স্বাভাবিক। কারণ, ভ্রমণসূচী ঘেঁটে যাওয়ায় আমাদের স্লট যে পেরিয়ে গেছে! নতুন করে নতুন গন্ডোলিয়ারদের সাথে যতক্ষণ চুক্তি চলছে সেই ফাঁকে আমাদের দেখা হয়ে যায় বেনারসের সরু গলির আদলে একের পর এক সারিবদ্ধ সংযুক্ত রাস্তা, পোষাকি নাম যাদের মার্সেরিয়ে। হাজার কিসিমের ভেনেসিয় মেমেন্টো সাজানো সেই রাস্তার দোকানগুলো যতই চোখ টানুক না কেন, আমাদের মন ভেসে চলেছে গন্ডোলার পথ বেয়ে। অবশেষে সেই মুহূর্তটাও এসে যায়, বিকেল ঠিক ৫টা ৪৫-এ । আমরা প্রথম পাঁচজন টলমল পায়ে উঠে বসি গন্ডোলার গদি-আঁটা সুখাসনে। নাতালিয়ার তত্ত্বাবধানে বাকী ১৯জন যখন

একে একে অপরাপর গন্ডোলিয়ারের হাত ধরছে, আমরা ততক্ষণে খালের জলে ভেসে চলেছি। আগেই বলেছি ভেনিসের খাল যেন মাকড়সার জাল।

একদিনের ২৫-৩০ মিনিট রাইডে সে খাল রহস্য ভেদ করার সাধ্য ফেলুদার থাকতে পারে, আমাদের নয়। মনের ইচ্ছেগুলো যেদিকে ডানা মেলেছে সেখানে কোনও গোয়েন্দা গল্প নেই, আছে এক অবাক জিজ্ঞাসু মন। অলি গলি চলি রামের মতো ছোট ছোট খালের গোলকধাঁধায় মন কিন্তু আটকে পড়েনা, নিয়ে চলে অতীতের ইতিহাসে – যখন ভেনিসের প্রাচীন বাসিন্দারা অ্যাড্রিয়াটিকের লেগুনে স্তূপাকার লার্চ, অ্যাল্ডার আর ওক গাছের কাঠ ফেলেছিল, সময়ের সাথে সাথে যে কাঠ কংক্রিটের চেয়েও বেশি শক্ত হয়ে ভেনিস নগরীর গোড়াপত্তন করে দেয়। সেই ভিতের উপর গড়ে ওঠা দু' পাশের সারি দেওয়া বাড়ির জানলা থেকে যখন কোনও মিশুকে কৌতূহলী পরিবার আমাদের উদ্দেশ্যে হাত নাড়ে, গলায় তো গান আসবেই, বিশেষত যদি অমিতাভ বচ্চন জিনাত আমনের 'দ্য গ্রেট গ্যাম্বলার' সিনেমার দৃশ্যটা মনে পড়ে যায়। আমাদের 'দো লাফজো কে হ্যায় দিল কি কাহানি' সম্ভবত সুদর্শন ভেনিসিয় গন্ডোলিয়ারকেও উদ্বুদ্ধ করে থাকবে, তাই নৌকা বাওয়ার সাথে উপরি পাওনা জুটে গেলো তার উদাত্ত গলার গান – 'আমোরে মিয়ো ......'। অসাধারণ সে প্রাপ্তি। খালের উপরে থাকা ব্রীজগুলোকে একে একে পার হয়ে অবশেষে আমরা পৌঁছই গ্র্যান্ড ক্যানেলের বিশাল বিস্তারে। সেখান থেকে আবার সেই সব মনুমেন্টই দেখি যাদের দেখে এসেছি পায়ে পায়ে দ্বীপ চক্কোরে। অবশেষে শেষ হয়ে যায় আধ ঘন্টার গন্ডোলার রাইড। ফিরে আসি সেই ঘাটেই যেখান থেকে আমাদের গন্ডোলাগুলো ছেড়েছিল। মনে হয় এটাই তো জীবন! যেখান থেকে এসেছি ফিরে যেতে তো হয় সেখানেই।

সমুদ্র যাত্রা

জল থেকে ভেনিস

এক নজরে ভেনিস

সেন্ট মার্ক’স স্কোয়ার ও ডোজ-এর প্রাসাদ

সেন্ট মার্ক’স স্কোয়ার

ভেনেসিওদের শুভেচ্ছা

গন্ডোলায় ভেসে

বিদায়ের আগে

বিশ্বরূপের প্রতীক্ষায় **সুনন্দন ঘোষ**

রোগান্তর কল্প শেষে
আত্মা ফিরে যেতে চায় অধ্যাত্ম সত্তায়।
মন ফিরে যেতে চায় প্রাণময় অবিনশ্বরতায় ।

লালসা, রিরংসা, জিঘাংসা -----
আত্ম-অবক্ষয়ের দীর্ঘ রাত্রি শেষে
ফিকে হয়ে আসে অন্ধকার।

পরিত্যক্ত, পরিশ্রান্ত যোদ্ধা আমরা
হাতে হাত ধরে
সাঁড়িয়ে আছি কুরুক্ষেত্র প্রান্তরে,
শেষ যুদ্ধ শুরুর আগে অন্তঃ-পুরুষের
বিশ্বরূপ ধারণের প্রতীক্ষায়।